উনিশ শতকের কলকাতায় শিষ্ট নাগরিক সাহিত্য ও অপর সাহিত্যের দ্বান্দ্বিকতা

৫০০০ শব্দের সারাৎসার

প্রস্তাবনা

উনিশ শতকের কলকাতায় শিষ্ট নাগরিক সাহিত্য বনাম অপর সাহিত্যের দ্বান্দ্বিকতার ইতিবৃত্ত বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে একটা অন্যতম গুরুত্ব দাবি করতে পারে। এক্ষেত্রে শিষ্ট নাগরিক বা মান্য সাহিত্য এবং অপর বা অ-নাগরিক সাহিত্য বলতে কী বোঝাচ্ছে সে সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা প্রয়োজন, এখানে যে অপর এর কথা তুলে ধরতে চেয়েছি সেই অপর এর নির্মাণ ততখানি অর্থনৈতিক নয়, যতখানি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক। এই নির্মাণের মূলে আছে এক সূক্ষ্ম রাজনীতি---পরিভাষার রাজনীতি, যা আসলে সাংস্কৃতিক রাজনীতির অন্যতম অঙ্গ, যা একটু একটু করে বাড়িয়ে তুলতে থাকে কেন্দ্র ও প্রান্তের মধ্যে বিভাজনের বিভেদরেখা। আর সাম্রাজ্যবাদের দূরদর্শিতায় এই বিচ্ছিন্নতাকে নানা ভাবে প্রশ্রয় দেওয়ার আয়োজন চলতে থাকে বিশ্ব জুড়ে।

শিষ্ট নাগরিক বা মান্য সাহিত্য বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি উনিশ শতকের মূলধারার সাহিত্যকে, যা প্রধানত নবজাগরণের পটভূমিতে, যুগের দাবিতে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্পর্শলাভের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছিল। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হবার পর পাশ্চাত্য প্রভুশক্তির অঙ্গুলিহেলনে প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ধারাপথেও একটা পরিবর্তনের জোয়ার এসেছিল। বদলে যাওয়া যুগ, জীবন এবং রুচির তাগিদে এতকালের প্রচলিত সাহিত্যধারায় প্রবাহিত হয়েছিল নতুন স্রোত। নব্য শিক্ষার জলবায়ুতে পুষ্ট হয়ে জন্মলাভ করেছিল নতুন দিনের নতুন সাহিত্যের অঙ্কুর, যা মূলত পাশ্চাত্য প্রভাবজাত। পাশ্চাত্য সাহিত্যের নানা রূপভেদ বাংলা সাহিত্যের সামনে নতুন পথের দিশা খুলে দিয়েছিল। সাহিত্যিক গদ্যের বিকাশ ও বিস্তার, পাশ্চাত্য মহাকাব্য ও রোমান্সের আদর্শে মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য, গীতিকাব্য, খণ্ডকবিতা, নাটক, উপন্যাস, সর্বোপরি ছোটগল্পের উন্মেষ---সব মিলে সে এক নতুন যুগ। সাহিত্যের বিচারেও তা স্বতন্ত্র মূল্যবোধের জন্ম দিয়েছিল। তখন থেকেই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত তথাকথিত ভদ্রশ্রেণির মধ্যে এই জাতীয় সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়েছিল। তাদের দ্বারাই সৃষ্ট এবং আস্বাদিত হতে শুরু করেছিল সাহিত্যের এই নানাবিধ শাখার নতুন সামগ্রী। এই ধারা আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত শিষ্ট সম্প্রদায়ের মননচর্চার ফসল বললে অত্যুক্তি হয় না। এর ফলে মূলধারার সাহিত্যক্ষেত্র যথেষ্ট

সমৃদ্ধ হয়েছিল, তাতেও সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন, তা হল এই নব্য সাহিত্যের পোষকতা করতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রেই ব্রাত্য করে দেওয়া হয়েছিল আমাদের অতীতের সাহিত্যের মূলধারাকেও। উনিশের মূলধারার সাহিত্য যেমন পাশ্চাত্যপ্রভুর প্রভাব এবং প্রসাদপুষ্ট, ঠিক তেমনি তার আগেও শাসকের অনুগ্রহপুষ্ট সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে উনিশের নব্য শিষ্ট সাহিত্যের ফারাকও অনেক। অতীতের মান্য সাহিত্যও শেষ পর্যন্ত তার গৌরব আর মর্যাদা বজায় রাখতে পারেনি। অর্থাৎ অতীতে যা ছিল তথাকথিত রাজপুরুষ, অভিজাত বা বিদগ্ধ মানুষের আস্বাদনের বস্তু, তাও নব্য শিক্ষিতের নাগরিক রুচির কাছে অবহেলিত এবং অভিযুক্ত হয়েছিল নানা কারণে। সুতরাং শিষ্ট সাহিত্য এদিক থেকে একেবারেই একটি পারিভাষিক রাজনৈতিক সংজ্ঞা, যা শাসকের বা প্রশাসকের রুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে নির্মাণ করে নেয়, নিজেকে পরিমার্জিত এবং পরিশীলিত করে যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় হয়ে ওঠে।

ঠিক এর বিপরীতে অপর সাহিত্য বলতে আমি বোঝাতে চাইছি দীর্ঘকাল ধরে এদেশের জনমানসের জীবনচর্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আমাদের দেশজ সাহিত্যধারাকে, যা উনিশ শতকের নবজাগৃতির ছোঁয়ায় ঋদ্ধ মুষ্টিমেয় মানুষের জ্ঞানচর্চার সীমানা ছাড়িয়ে বিস্তৃত ছিল আপামর জনসাধারণের অঙ্গনে। এই সাহিত্য সংখ্যাগরিষ্ঠের, এই সাহিত্য জনপ্রিয়। এর মধ্যে একটা বড় স্থান অধিকার করে আছে বটতলার সাহিত্য। আশিস খাস্তগীর বলছেন ‘উনিশ শতকীয় বাংলা কালচারের দুটি পিঠ। একদিকে এলিট ক্লাস তথা ভদ্রলোকীয় কালচার, অন্যদিকে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালানো বটতলা কালচার। ইতিহাস বলছে উনিশ শতকের বাংলা বইয়ের বেড়ে ওঠার অন্যতম আঁতুড়ঘর এবং কারিগর এই বটতলা। সেকালে জনরুচির বড়ো অংশের ধারক বটতলা। আজকের দিনে ‘পাবলিক টেস্ট’ বা জনরুচি বলতে যা বুঝি, সেকালে বটতলাই তার নাড়ির গতি সর্বপ্রথম সঠিকভাবে ধরতে পেরেছিল।’[১] কিন্তু বৃহত্তর জনসমাজের রুচি আর চাহিদা অনুযায়ী গড়ে ওঠা এই দেশজ সাহিত্য এবং তার পাশাপাশি বয়ে চলা দেশজ সংস্কৃতি কিন্তু উনিশ শতকের মূলধারার বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস চর্চায় সেভাবে স্থান পায়নি। বরং মূলধারার সাহিত্য তাকে অস্বীকরণের পথে হেঁটেছে। ফলে উনিশ শতকের সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারাপথে একটা স্পষ্ট বিভাজন-রেখার অস্তিত্ব অনুভূত হয়। এই ভেদরেখার একদিকে পরিশীলিত শিষ্ট নাগরিক সাহিত্য, অন্যদিকে অপর সাহিত্য।

আসলে সামাজিক দিক থেকে যারা মান্য বা শিষ্ট নাগরিক শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির বৃত্তের বাইরে অবস্থান করছে, তাদের সৃষ্টিও কোথাও গিয়ে হয়ে উঠেছে অপর। তারা পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার আলোকিত জগতের বাইরের মানুষ, তারা কেন্দ্র

থেকে দূরবর্তী, তারা সংখ্যার দিক থেকে যাই হোক না কেন, গুরুত্বের দিক থেকে খাটো। সুতরাং তাদের দ্বারা সৃষ্ট বা আস্বাদিত সাহিত্য অপর, তাদের সংস্কৃতিও তাই। কাজেই বৃহত্তর পরিসরের লোকজীবনাশ্রিত সাহিত্য, সংস্কৃতি এমনকি লৌকিক ধর্ম-কর্ম পর্যন্ত যথেষ্ট নিন্দিত এবং পর্যুদস্ত হয়েছে শিষ্ট নাগরিক সাহিত্য-সংস্কৃতির পোষকদের কাছে। নীতি এবং রুচির প্রশ্ন তুলে মুষ্টিমেয় উচ্চবর্গীয় নীতিবাগীশ পণ্ডিত ও তাদের অনুগত শ্রেণি বারে বারে হেনস্থা করেছে তথাকথিত অপর সাহিত্যকে। বলা হয়েছে তা মূলত বিকৃতরুচি ও কামগন্ধে ভরা। অনিন্দিতা ঘোষ জানাচ্ছেন 'প্রকৃতপক্ষে, পাশ্চাত্য সভ্যতার ছায়ায় পালিত উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি তার দেশজ ঐতিহ্যের জনপ্রিয় ও জীবন্ত ধারাটিকে 'ইতর' ও 'অশ্লীল' সাব্যস্ত করে তার সার্বিক সংস্কারে উদ্যোগী হয়। উচ্চশিক্ষিত বিদ্বজ্জনের সংশোধনকারী অভিধানে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত বটতলা তাই হাজির হয় সভ্যতার কাঠগড়ায়, এবং সময়ে অপবাদটি প্রবর্তিত হয় পরবর্তী প্রজন্মের হাতে।'[২]

উনিশ শতকের নাগরিক সাহিত্য কাব্য, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন শাখায় বিকশিত হয়েছিল। পরিশীলিত মার্জিত রুচির বিদ্বৎজনেরা ছিলেন সেইসব সৃষ্টির রসভোক্তা। ঠিক তারই পাশাপাশি বয়ে চলা অপর সাহিত্যের ধারাটিও কিন্তু একমুখী ছিল না। বটতলার নকশা, প্রহসন, উপাখ্যান, পাঁচালি, ব্রতকথা থেকে শুরু করে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনি, আদিরসাত্মক রচনা এমনকি বেশ্যাসঙ্গীত অবধি সবই ছিল তার মধ্যে। শ্রীপান্থ বলছেন 'সত্যি বলতে কী, বিষয় বৈচিত্র্যে বটতলার কোনও তুলনা নেই। ধর্ম, পুরাণ, মহাকাব্য, কাব্য সংগীত, নাটক, কাহিনি, যাত্রার বই (পরে থিয়েটারেরও), পঞ্জিকা, সাময়িকপত্র, শিশুপাঠ্য, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতিষ, অভিধান, ভাষাশিক্ষা, কারিগরিবিদ্যা---এমন কোনও বিষয় নেই যা ছিল বটতলার কাছে অজানা। সংস্কৃত, ফরাসি, উর্দু, ইংরেজি- নানা উৎস থেকে কাহিনি সংগ্রহ করেছেন বটতলার লেখক ও প্রকাশকরা।...বটতলা সেদিক থেকে সাধারণ বাঙালির কাছে যেন এক খোলামেলা বিশ্ববিদ্যালয়, আজকের ভাষায় যাকে বলে 'ওপেন ইউনিভার্স্টি।'[৩] সাধারণ জনগণ তা থেকেই খুঁজে নিতেন মনের খোরাক। আর এই বটতলার জন্যই কিন্তু সাধারণ মানুষের ছাপা বই পড়ার সৌভাগ্য হত। কারণ শিষ্টবর্গের অনুমোদিত ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত বই জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে ছিল। আসলে উনিশ শতকের বটতলা ছিল যাবতীয় বই প্রকাশনা এবং বিক্রির এক বড় কেন্দ্রস্থল। অথচ তৎকালীন মেধাজীবীরা যখন নিন্দা করছেন তখন বেছে নিচ্ছেন কেবল সস্তা চটকদার বইগুলিকেই। অদ্রীশ বিশ্বাস বলেছেন 'বটতলাকে সামাজিক অধঃপতনের টেক্সট হিসাবে উচ্চবর্গের আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে বারবার, কিন্তু বটতলাই হল সেই সত্য-দর্পণ যেখানে সমাজের মুখোশ-পরা মিথ্যা ছবিটা নয়, মুখোশহীন আসল রূপটা

ধরা পড়েছে। সেটা প্রধান ধারার লেখক-পাঠক-বুদ্ধিজীবীদের ভাল লাগেনি। বটতলা তা মান্য করেনি। সে তার পথে চলেছে।’[4] পরিণামে জুটেছে লাঞ্ছনা।

এই বিভাজনের মূলে আছে চিরন্তন শাসক-শাসিতের, বিজয়ী-বিজিতের, জয়-পরাজয়ের রাজনৈতিক অঙ্ক। শিষ্ট নাগরিক সাহিত্য মুষ্টিমেয় মানুষের মননশীলতার সামগ্রী, সমাজের উচ্চবর্গের নবজাগৃতির আলোকিত পরিসরেই তার চলাচল। তার বিপরীতে অপর সাহিত্য অগণিত মানুষের তৃপ্তির খোরাক যোগান দিয়েছে। তবু পরিণামে সংখ্যাগরিষ্ঠের জিত হয়নি। জিত হয়েছে ক্ষমতার। বটতলার প্রতি বীতরাগ হয়ে, তাকে শুধু সমালোচনা করে নয়, একেবারে অস্বীকার করে মূলধারার সাহিত্য এগিয়ে গেছে, তারই একটা হেজিমনি তৈরি হয়ে গেছে। এটা জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রকৃত দৃষ্টান্ত। এটাকে মিশেল ফুকোর সেই ‘পাওয়ার নলেজ’ এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। আসলে পাওয়ার নলেজ বা জ্ঞানক্ষমতা এমনভাবে কাজ করে যে তার অননুমোদিত সবকিছু আস্তে আস্তে মাইনর নলেজে পর্যবসিত হয়। এভাবেই নির্মিত হয়ে ওঠে একটা মূলধারা বা মেইন স্ট্রিম, আর বাকি সবকিছু হয়ে ওঠে অপর বা প্রান্তিক। এখানেও তেমনটা ঘটেছে। আর এই সবের মূলে রয়ে গেছে আধিপত্য আর আনুগত্যের চিরন্তন সমীকরণ। চিরকালই উচ্চবর্গ এবং ক্ষমতাবান নিজেদের পছন্দকে প্রাধান্য দিয়ে মহিমান্বিত করে অপছন্দকে প্রান্তিক করে দিতে চায়। ছলনার রাজনীতিতে বড় বেশি পাকাপোক্ত বলেই বোধহয় তাদের নির্মিত অথবা অনুমোদিত সবকিছুই সমস্ত আলো শুষে নেয়, বাকি সবটুকু থেকে যায় অন্ধকারে। তাই তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত-পালিত সাহিত্য রাজপথ ধরে সগর্বে এগিয়ে চলতে থাকে। আর ছলনার রাজনীতিতে অজ্ঞতার কারণেই পিছিয়ে পড়তে হয় অপর সাহিত্যকে। এই যুদ্ধ আসলে এক অসম যুদ্ধ। এ এক আশ্চর্য সাংস্কৃতিক রাজনীতি, যার ফলে কৌশলে ভুলিয়ে দিতে চাওয়া হয় শিকড়ের টান। এখানেও এই রাজনীতির চোরাস্রোতের আবর্তেই আমাদের নিজস্ব সাহিত্যধারা অপর নামে অভিহিত হয়ে নিন্দিত আর নির্যাতিত হয়েছে আমাদেরই হাতে। আসলে রেনেসাঁস ঘেঁষা উচ্চমানের সাহিত্য-সংস্কৃতির পিছনে ছিল ক্ষমতাশালী উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের এক সামাজিক কারিগরি পরিকল্পনা। শাসক আর শাসকঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর এই কারিগরি পরিকল্পনাই নিখুঁতভাবে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের ফলাফল ঘোষণা করে দিয়েছে। যেখানে পাশ্চাত্য-মডেল নির্ভর নাগরিক সাহিত্য বহাল তবিয়তে বিরাজ করেছে, বাংলা সাহিত্যে তারই প্রাধান্য লক্ষিত হয়েছে আগামীদিনে। আর ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে অপর সাহিত্যের স্মৃতি। বিশেষ করে উনিশ শতকের এই বিপুল বৈচিত্র্যময় ধারাটি কেমন যেন হেলায় হারিয়ে গেছে আগামীতে। তাই এর তেমনভাবে সংরক্ষণ হয়নি, চর্চা হয়নি।

এই আধিপত্যবাদের রাজনীতি শুধুমাত্র আধুনিক সময়ের দান নয়। আদিযুগ থেকেই পৃথিবীর ইতিহাসে রক্ষিত হয়েছে ক্ষমতাবানের প্রার্থনা, সুরক্ষিত হয়েছে আধিপত্যবাদের সাম্রাজ্য। বিশেষত ভারতবর্ষে আর্য-অনার্যের, উচ্চ-নিম্নের অজস্র যুগসঞ্জাত বিরোধ আবহমানকাল ধরে জমি প্রস্তুত করেই রেখেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সেই সুযোগের ফায়দা লুটতে দ্বিধা করেনি। সঙ্গত কারণেই নতুন আলোকের ফাঁদ নতুন নাম নিয়ে আরেকবার উনিশ শতকে এই বিচ্ছিন্নতার রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে পদানতের ঐতিহ্যকে আঘাত করেছে, তাকে সুকৌশলে বিনষ্ট করে দিতে চেয়েছে। মানুষের সত্তা এবং বোধের ওপর সার্বিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে গিয়ে নির্মাণ করেছে ক্ষমতার নানাবিধ ছদ্মবেশী বয়ান। ক্ষমতা সর্বব্যাপ্ত, বলেছিলেন ফুকো। মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আর কার্যপ্রণালীর মধ্যে এমন স্বতঃসিদ্ধতায় সেই ক্ষমতার বীজ আত্মগোপন করে থাকে যে সহজে বোঝা যায় না তার মধ্যে নিহিত নির্মম আধিপত্যের ভাষা, বিরুদ্ধ অস্তিত্বকে ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলার ভাষা, তাকে বিধ্বস্ত করে ফেলার ভাষা। ক্ষমতা বা প্রতাপই জ্ঞানের উৎপাদক ও নিয়ন্তা, ফুকো একথা জানিয়েছেন। তাঁর কথায় 'জ্ঞান ও প্রতাপ প্রত্যক্ষভাবে পরস্পরকে দ্যোতিত করে এবং এমন কোনও প্রতাপ-সম্পর্ক সমাজে হতেই পারে না যা সংশ্লিষ্ট জ্ঞান-প্রস্থানকে সংগঠিত করে না।'[৫] এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বরং ক্ষমতাশালীরা ক্ষমতার ব্যবহার করে অপর সাহিত্যকে সবদিক থেকে ব্রাত্য করে দিতে চেয়েছেন। অদ্রীশ বিশ্বাস জানাচ্ছেন 'বটতলার সামাজিকতা ভুলে, বিশাল সংখ্যক জনসাধারণের রুচিকে অগ্রাহ্য করে, জনমনস্তত্ত্বকে নস্যাৎ করে, ভাবনা প্রকাশের সুযোগকে অগ্রাহ্য করে, দেশীয় ডিসকোর্সের সবচেয়ে বড় স্পেস-সেই দৃষ্টিকোণকে অগ্রাহ্য করে, উচ্চ-অপর অবস্থানের সামাজিক ও নন্দনতাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের নথিপত্র-সেই তথ্য ভুলে, শুধুমাত্র 'জঘন্য' শব্দে উচ্চবর্গীয় অবস্থান নিয়ে নস্যাৎ করে দেওয়াটা বহুকালের বটতলা সম্পর্কিত রাজনীতি।'[৬] জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে সাহিত্যিক মানচিত্রে ফাটল বাড়িয়ে তুলেছেন আলোকপ্রাপ্ত সম্প্রদায়। দেশজ সাহিত্য আর সংস্কৃতির শিকড় উপড়ে ফেলার এই চক্রান্তের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে সমকালের অশ্লীলতাকেন্দ্রিক একটি বিতর্ক। এই পর্বেই বাঙালি শিক্ষিত সমাজে মাথাচাড়া দিয়েছে অশ্লীলতার প্রেত।

আসলে উনিশ শতকের কলকাতায় 'অশ্লীলতা'র যে সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছিল তা ছিল সম্পূর্ণভাবে আধিপত্যকামী শাসকের অঙ্গুলিহেলনে তার ভক্তবৃন্দ কর্তৃক নির্ধারিত একটি ধারণা, যা আমদানি করা হয়েছিল পাশ্চাত্য থেকে। পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা এসব ধারণা ক্রমে ইংরেজি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মগজে এঁটে বসতে শুরু করল। তার ফলে বঙ্গজীবনের অঙ্গরূপে থাকা এতকালের প্রচলিত নানা বিষয়ের শ্লীলতা-অশ্লীলতা বিচার করা হতে থাকল পাশ্চাত্য প্রভুর অঙ্গুলিনির্দেশে নির্মিত

মানদণ্ডে। সাহিত্য-সংস্কৃতি কিছুই সেই কঠিন একদেশদর্শী বিচার থেকে রেহাই পেল না। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই বিতর্ক প্রবল আকার ধারণ করল। সাহিত্য যে কেবল ব্যক্তিগত বা কেবল সমাজগত রুচির মাপকাঠিতে বিচার্য নয়, এমনটা ভাবার মত মতি শুচিবায়ুগ্রস্তদের ছিল না। বরং ভিক্টোরীয় যুগের নৈতিক শুচিতার পুচ্ছ ধরে ইংরেজ-ঘনিষ্ঠ বাঙালি অশ্লীলতার এক নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিল। পাশ্চাত্যে ভিক্টোরীয় নৈতিকতা এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে Thomas Bowdler শেক্সপিয়রের কালজয়ী নাটককে অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে তার শ্লীল সংস্করণ প্রস্তুত করতে শুরু করেন। ঠিক একই ভাবে প্রভুর অনুগত ভৃত্যের মত এদেশেও কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীদাসী মহাভারতের শ্লীল সংস্করণের কাজ শুরু করেন অধ্যাপক পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার (১৭৭৫-১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দ)। এদেশের সর্বজনমান্য সাহিত্যিক নিদর্শনগুলিই যখন অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়, তখন লোকজ পরম্পরার সাহিত্য-সংস্কৃতি যে তা থেকে নিস্তার পাবে না, সেকথা বলাই বাহুল্য। এর ফলে জনরুচির পরিপোষকতাকারী সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ধারাগুলি বেশ খানিকটা ধাক্কা খেয়েছিল। বিশেষত এই কারণে জনতার সাহিত্য-দরবার বটতলার বেশ হয়রানি হয়েছিল। আসলে বটতলাকে কোণঠাসা করার পিছনে অন্য একটা কারণও ছিল। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকেই স্কুল বুক সোসাইটির সাহায্যে নীতিমূলক পুস্তিকা প্রচার শুরু হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন সেখান থেকে ছেপে বেরোনো নীতিমূলক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থগুলিকে বটতলার বইয়ের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতায় পড়তে হচ্ছিল। জনমনে কিছুতেই সংস্কারকের উপদেশাবলী বটতলা সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাবের জন্ম দিতে পারছিল না। তাই বাধ্য হয়েই আইন এবং প্রশাসনের সাহায্য নিতে হয়েছিল। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ রেভারেন্ড জেমস লঙ কলকাতার নানা ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত প্রায় ১৪০০ বইয়ের একটি তালিকা তৈরি করে প্রকাশ করেন। সেই তালিকায় কবিগান, পাঁচালি ইত্যাদির যে সংকলনগুলি ছিল সেগুলি তাঁর ভাষায় ছিল filthy and polluting, আর কামশাস্ত্রমূলক, আদি বা শৃঙ্গাররসাত্মক বইগুলি (যেমন কামশাস্ত্র, রসতরঙ্গিণী, প্রেমতরঙ্গ, রতিবিলাস, সম্ভোগ রত্নাকর ইত্যাদি) তাঁর মতে 'বিস্টলি, ইকুয়াল টু দ্য ওয়ার্স্ট অফ দ্য ফ্রেঞ্চ স্কুল।'[৭] তাঁর এই তালিকা প্রকাশের পরের বছরই ভারতীয় আইনসভায় অশ্লীলতা বিষয়ে আইন পাস হয়। আর তা গভর্নর জেনারেলের অনুমোদন লাভ করে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ২১ তারিখে। আইন অনুসারে কুৎসিত ছবি এবং শৃঙ্গাররসঘটিত পুস্তক প্রকাশ আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত হয়েছিল 'দি সোসাইটি ফর দি সাপ্রেশন অব অবসিনিটি ইন ইন্ডিয়া'। এভাবেই শিষ্ট নাগরিক সাহিত্যের পালক পোষকরা নানা দিক থেকে অপর সাহিত্যকে নির্মূল করে দিতে চেয়েছিলেন।

শাসন তো কেবলমাত্র বহিরাঙ্গিক ক্ষমতার বিস্তার মাত্র নয়, নয় কেবল উপনিবেশের সংখ্যাবৃদ্ধি, শাসন অর্থে সূক্ষ্মভাবে শাসিতের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে একচ্ছত্র ক্ষমতার বিস্তার---সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের বিপুল আগ্রাসনের চাপে যেখানে শাসিত একসময় স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নেয় প্রভু সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বকে। এখানেও তাই হয়েছে। শুধু ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের বিভাজনেই বিষয়টা সীমাবদ্ধ থাকেনি, নন্দনতত্ত্ব ও পাঠ-অবস্থানের দিক থেকেও দেশের মানুষ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। দেশের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে এই আলোকপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর আলোকবর্ষের দূরত্ব, উভয়ের মন-মানসিকতার পার্থক্য সবই এই গূঢ় রাজনৈতিক চক্রান্তের অন্তর্গত বলে মনে হয়।

তবু সময়ের প্রত্যাঘাত সময়েরই হাতে। ঔপনিবেশিক শাসন আর এদেশীয় ভদ্রলোকেদের যাবতীয় প্রয়াস সত্ত্বেও দেশীয় সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ধারা একেবারে বিনা যুদ্ধে ময়দান ছেড়ে দেয়নি। বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে মূলধারার সাহিত্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছে, তার ভেতর থেকে উঠে এসেছে প্রতিবাদ। তার লড়াই ছিল কঠিন। তা ছিল উচ্চবর্গের নিয়ন্ত্রিত বাজারের সঙ্গে, প্রাতিষ্ঠানিক আর আধিপত্যবাদী জ্ঞানচর্চার বিপরীতে দাঁড়িয়ে। বিষয়বস্তু হিসেবে তা চিরায়তের পাশাপাশি সাময়িকতাকেও গ্রহণ করেছে। নানাবিধ সামাজিক বিতর্ক স্থান পেয়েছে তার দুই মলাটের মধ্যে। শিষ্ট সাহিত্য এবং তার ধারকদের পরিহাস করার সাহসও রেখেছে সে। যদিও বহুক্ষেত্রেই সে রক্ষণশীল, আধুনিকতার নানা বন্দোবস্তকে সাদা চোখে মানতেও পারেনি সবসময়। তাই হয়তো সে প্রগতিশীল নয়, কিন্তু জনপ্রিয় অবস্থান থেকে শিষ্ট বনাম অপরের নৈতিকতা বিষয়ক লড়াইটা সে লড়েছে। এটাকেই দেখা যেতে পারে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে দুই ভিন্নমাত্রিক সংঘাতের এক চরম অভিব্যক্তি রূপে।

উনিশ শতকের শিষ্ট নাগরিক সাহিত্য এবং তথাকথিত অপর সাহিত্যসম্ভার থেকে সূত্র সন্ধান করেই আমি উভয়ের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের রসায়নটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে আমার অবলম্বন হয়েছে তুলনামূলক আলোচনা পদ্ধতি। আমার গবেষণা কর্মটিকে যেভাবে বিন্যস্ত করেছি তাতে প্রথমে আছে একটি প্রস্তাবনা, তারপরে পাঁচটি অধ্যায় এবং শেষে উপসংহার।

প্রথম অধ্যায়
উনিশ শতকের কলকাতার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট : শিষ্ট বা ভদ্র (লোক) ও অপর

এই অধ্যায়ে আমি উনিশ শতকের কলকাতার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করেছি। যে কোনো আলোচনার ক্ষেত্রেই স্থান, কাল এবং বিষয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এইখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এখানে স্থান নতুন নগর কলকাতা ও কাল উনিশ শতক এবং বিষয় সেই নতুন নগরের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে ভদ্রলোক আর অপরের সম্পর্কে আলোকপাত করা। উনিশ শতকের নাগরিক ভদ্রশ্রেণি এবং অপর সম্পর্কে ধারণা দিতে গেলে যে পরিস্থিতিতে, যে পরিবেশে তাদের উদ্ভব ও বিস্তার, সেখানকার আর্থ-সামাজিক পটভূমি সম্পর্কে জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। আসলে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্তর্লীন সংযোগকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না। বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কিত। আমরা জানি বাঙালি জীবনে নতুন নাগরিকতার সংজ্ঞা নির্ধারণে কলকাতা নগরের ভূমিকা কম নয়। এপ্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ বলেছিলেন : ‘বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে কলিকাতার প্রাধান্য ও গুরুত্ব কোনো সমাজবিজ্ঞানীই অস্বীকার করতে পারেন না। কলিকাতা মহানগরই বাংলার নতুন জীবনধারার প্রধান কেন্দ্র। তাই কলিকাতাই বাংলার নতুন ভাবধারা, নতুন মানস প্রকৃতি ও নবজাগৃতির উৎস।’[৮] তাই প্রথমেই নগর কলকাতার উত্থান সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা উল্লেখ করেছি। সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলকাতা নামক তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করেই নতুন মহানগরের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। বৈচিত্র্যে ভরা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এর আধুনিক নগরে রূপান্তরিত হবার ইতিহাসও অভিনব। বৈদেশিক নানা শক্তির পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ইংরেজরা প্রথমে এদেশে বাণিজ্যের অধিকার লাভ করেছিল, কালক্রমে এদেশের শাসকের দুর্বলতা, অভ্যন্তরীণ অশান্তি ইত্যাদির জেরে শাসক হয়ে উঠেছিল। তাদের সুতানুটির বাণিজ্যকুঠিও ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়েছিল এবং কলকাতা ক্রমে সুসংবদ্ধ নগরের চেহারা পাচ্ছিল। সবচেয়ে বড় কথা উনিশ শতকের আগেই কলকাতা হয়ে উঠেছিল নতুন রাজধানী। সমালোচক উল্লেখ করেছেন: ‘It is unquestionable that by British Statesmanship, courage and firmness, England has been able to secure for herself her great Indian Empire here, in Calcutta, events of momentous consequence have been enacted which form an important chapter in the history of the world.’[৯] আর ইংরেজ প্রবর্তিত নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ফলে ‘অ্যাবসেন্টি জমিদার’দের জন্ম

হয়েছিল। ইতিমধ্যে নগরের অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যের টানে গ্রাম থেকে শহরের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল মানুষের মন। নতুন শহরে ছিল নতুন জীবন আস্বাদনের হাতছানি এবং নতুন সামাজিক মর্যাদা লাভের সুযোগ, যা বর্ণগত ততটা নয়, যতটা বৃত্তিগত। গ্রামের শ্রী নিংড়ে লক্ষ্মীদেবী শহরবাসিনী হয়েছিলেন। টাকার আকাশছোঁয়া প্রাচীর গ্রাম আর শহরের মধ্যে যে ব্যবধান রচনা করেছিল তা আর কখনো ঘোচেনি। এদিকে নগর কলকাতা তখন বিভক্ত ছিল দুভাগে---শ্বেতাঙ্গের কলকাতা এবং কৃষ্ণাঙ্গের কলকাতায়, যার পোশাকি নাম ছিল হোয়াইট টাউন এবং ব্ল্যাক টাউন। হোয়াইট টাউনে বসতি ছিল সাদা চামড়ার শাসকশ্রেণির। আর ব্ল্যাক টাউনে বাস করত এদেশের জনগণ। তাদের মধ্যেও শ্রেণিবিভাজন ছিল। ধনী, বিত্তশালী অভিজাতদের পাশাপাশি ছিল নিম্নবিত্ত দিন-আনা-দিন-খাওয়া মানুষেরাও। পরিস্থিতির চাপে, জীবিকাহীন হয়ে ছিন্নমূল এসব মানুষ এসে পড়েছিল শহর কলকাতায় রুটিরুজির সন্ধানে। এই অভিবাসীরাই ছিল কলকাতার আদিপর্বের তথাকথিত উচ্চবর্গ এবং নিম্নবর্গ। উভয় শ্রেণির মধ্যে বিত্তগত ব্যবধান থাকলেও অন্যান্য বিষয়ে, যেমন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংহতির ক্ষেত্রে তেমন কোনো বিচ্ছিন্নতার আবহ ছিল না। এমনকি সে সময়ে ইংরেজ এবং ভারতীয়দের মধ্যেও সামাজিক দূরত্ববোধ ছিল কম। লর্ড ওয়েলেসলির আমল থেকেই শাসক শাসিতের ব্যবধান বেড়ে উঠতে থাকে। শাসকজাতি হিসেবে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার প্রয়াস এবং সচেতনতা দেখা যায় উনিশ শতকের আলোকিত প্রহরে। আর এই সময় কলকাতার নগরজীবনও এক নতুন মোড় নেয়। এই সময়পর্বেই বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির আবির্ভাব হয়। ইংরেজি শিক্ষা আর আধুনিকতার প্রসারের ফলে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি হতে থাকে। এদেশের উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের ইংরেজি শিক্ষার সংশ্রবে ইউরোপীয় মন্ত্রপাঠে প্রশিক্ষিত করা, বিশ্ব-বীক্ষার পাঠ দেওয়ার মধ্যে দিয়ে আসলে মানুষের চৈতন্য অধিকারের সচেতন রাজনীতির অঙ্কটি কষতে ঔপনিবেশিক শাসকের ভুল হয়নি। এই সময়েই নির্মিত হচ্ছিল নতুন নাগরিকের সংজ্ঞা। ভদ্রলোক এবং অপরের ধারণাটি বিনির্মিত হচ্ছিল নব্যশিক্ষার মানদণ্ডে। যদি ভদ্রলোকের ইতিহাস খুঁজি তাহলে দেখতে পাব অতি প্রাচীনকাল থেকেই সমাজে এই শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু সেই ভদ্রলোক ছিল জাতি বা বর্ণগতভাবে স্বতন্ত্র এক শ্রেণি। উনিশ শতকে এসে পাশ্চাত্য প্রভুশক্তির অঙ্গুলিহেলনে নতুন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে ভদ্রলোকের ধারণাটি বিবর্তিত হতে লাগল। বাঙালি ভদ্রলোক বলতে উনিশ শতকের শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত প্রভাব আর প্রতাপশালী নাগরিকদের বোঝানো হতে লাগল। আর উনিশের নবজাগৃতির বাইরে থেকে যাওয়া আপামর জনতা হয়ে উঠল অপর। মানুষে মানুষে ব্যবধান বেড়ে উঠল। শাসক নিজ স্বার্থে তাকে প্রশ্রয় দিল। আসলে শুধু ভূখণ্ড নয়, মন বিভাজনের নীতিতে তারা ছিল

দক্ষ। পাশ্চাত্য ভাবনায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা স্বদেশের জনসমষ্টিকে তাঁদের অনুভবের জগতে টেনে আনতে পারেননি, দুই শ্রেণির মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ বেড়েছে। অবশ্য তাঁদের আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই তাঁদের সীমাবদ্ধতা নিহিত ছিল। অরবিন্দ পোদ্দারের কথায় 'তাঁরা ভিনদেশী এক সমাজের আন্তরপ্রেরণায়, উদ্ভিন্ন হয়েছিলেন স্বদেশীয় সমাজের অন্তর ভেদ করে।'[১০] আসলে ইউরোপীয়ান আদর্শপুষ্ট হয়ে এদেশের শিক্ষিত এলিট গড়ে উঠেছিল। সেই আদর্শের বীজ থেকে অঙ্কুর এবং অঙ্কুর থেকে গাছ, ফুল, ফল হবার মতো দেশের মানুষের মনের মাটি তৈরি হয়নি। এই দূরত্বই উনিশ শতকের কলকাতার জনসমষ্টির দ্বিধাবিভক্তিকরণের জন্য দায়ী বললে ভুল হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মান্য বা শিষ্ট তথা নাগরিক সাহিত্য-সংস্কৃতির উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তন

এই অধ্যায়ে আমি মান্য বা শিষ্ট তথা নাগরিক সাহিত্য-সংস্কৃতির উদ্ভব, বিকাশ এবং বিবর্তন সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে চেয়েছি। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বাঙালির নাগরিক সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে বেশিরভাগ সময়েই আমাদের রাজসভা-সাহিত্যের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। প্রাগাধুনিক সাহিত্যের ইতিহাস মূলত রাজন্যবর্গ আর অভিজাত সমাজের পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাস। প্রাচীনকাল থেকে মূলত রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায়, রাজসভাকেন্দ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থায় যে প্রসাধিত মার্জিত সাহিত্যসম্ভার গড়ে উঠেছিল, তা-ই নাগরিক সাহিত্যের দলিল হয়ে আছে। বিশেষত অভিজাত নাগরিক জীবনের অসামান্য চিত্র সেখানে মেলে। তবে প্রমথ চৌধুরীর ভাষা ধার করে বলা যেতে পারে এখানে নাগরিক বলতে শুধুমাত্র 'man about town'[১১] বোঝাচ্ছে না, এখানে নাগরিক বলতে বোঝাচ্ছে বিদগ্ধ। সেই বিদগ্ধমণ্ডলীর যে সাহিত্যচর্চা, তা-ই ছিল অতীতের মান্য নাগরিক সাহিত্য। এই সাহিত্য মূলত ছিল রুটি আর রুচির কর্তার 'রসনারোচন রসিক বিলাস' এর উপকরণ। সেখানে প্রাধান্য পেত পৃষ্ঠপোষকের স্তুতি, যুদ্ধবর্ণনা, আদি বা শৃঙ্গাররসের চর্চা ইত্যাদি উত্তেজক এবং মনোরঞ্জক বিষয়। রচনাকেও হতে হত ছন্দে, অলঙ্কারে, সুনিপুণ মণ্ডনকলার পারিপাট্যে প্রযত্নসাধিত। সেই অতীতের পাল-সেন যুগ থেকে অষ্টাদশের কৃষ্ণনগর রাজসভার ভারতচন্দ্র পর্যন্ত সেই সভাকাব্যের ধারা বিস্তৃত ছিল, কেবল তাতে অঙ্গীভূত হয়েছিল সময়ের চিহ্ন। কিন্তু উনিশ শতকের নগর কলকাতায় মান্য বা শিষ্ট নাগরিক সাহিত্য বলে যা স্বীকৃতি পেয়েছিল, তার সঙ্গে অতীতের সভা সাহিত্যের তো বটেই, এমনকি নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ বা কৃষ্ণনগরের নাগরিক সাহিত্যেরও সাদৃশ্য খোঁজা সঙ্গত নয়। এই সাহিত্য একেবারেই ভিন্নমাত্রিক। নবজাগরণের নতুন আলোকে আলোকিত নতুন

নগরের নতুন নাগরিকের নতুন চিন্তার নতুন ফসল। এই সাহিত্য মূলত পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শে উদ্ভূত। বিভিন্ন তার রূপভেদ, বিচিত্র তার শৈলী, বিপুল তার বিস্তার। সাহিত্য বিচারেও তা স্বতন্ত্র মূল্যবোধের জন্ম দিল। বিশেষত নবজাগৃতির আলোকপুষ্ট, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণির মধ্যে এই জাতীয় সাহিত্যের চর্চা শুরু হল। তাদের দ্বারাই সৃষ্ট এবং আস্বাদিত হতে লাগল এই ধারাটি। এতকালের প্রচলিত নাগরিক সাহিত্যের সঙ্গে উনিশের কলকাতার নাগরিক সাহিত্যের এই প্রভেদের মূলে শুধু যে যুগের দাবি ক্রিয়াশীল ছিল, তা নয়। তারই সঙ্গে ছিল সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের এক নতুন খেলা। পাশ্চাত্য প্রভুশক্তির অঙ্গুলিহেলনে প্রশাসনিক কাঠামো বদলের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ধারাপথেও একটা বড় বিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। এই কালপর্বের মূলধারার সাহিত্যে পাশ্চাত্যের প্রভাবপুষ্ট সাহিত্যশাখাগুলিরই প্রাধান্য লক্ষিত হল। আর এতকাল যা ছিল মানুষের আস্বাদনের বস্তু, সেগুলি ব্রাত্য হতে শুরু করল। তথাকথিত রাজপুরুষ, অভিজাত বা বিদগ্ধদের মনোরঞ্জক সাহিত্য পর্যন্ত শেষপর্যন্ত অভিযুক্ত হল অশ্লীলতার অভিযোগে। আর ইংরেজের অনুগ্রহপুষ্ট শিষ্টবর্গের কাছে তা খারিজ হয়ে যেতে লাগল। আর তারই পাশাপাশি নব্য নাগরিকের রুচির অনুমোদিত হয়ে বিকশিত হয়ে উঠল উনিশ শতকের নতুন নাগরিক সাহিত্য।

তৃতীয় অধ্যায়
অপর সাহিত্য : পরম্পরা ও 'অপর' হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত

এই অধ্যায়ে আমি প্রধানত 'অপর' সাহিত্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে চেয়েছি। অপরতার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কিন্তু আদি কথা সেক্ষেত্রে একটাই। আসলে যা মূলধারার অন্তর্গত নয়, তা-ই অনায়াসে অপর এর তকমা পেয়ে যেতে বাধ্য। আর সাহিত্য যেহেতু জীবন-সম্ভূত, কাজেই তার মধ্যেও যে এই ধারণা অনুপ্রবিষ্ট হবে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক পূর্বসূত্র সন্ধান করলে দেখা যায় যে প্রাচীন বাংলায় উচ্চ-অনুচ্চের নানা ধর্ম, সম্প্রদায় ও শ্রেণিগত বিভাজন থাকলেও সাহিত্যের ইতিহাসে তা কখনো বিরোধের উগ্রতা সৃষ্টি করেনি। তার ফলে অভিজাত বাঙালির জীবন-কথার সঙ্গে লোক-বাঙালির জীবন-কথার ভাব-ঘনিষ্ঠতার অভাব ছিল না। বরং এরই ফলে বাংলা সাহিত্যের সমন্বয়ধর্মী প্রেরণাটি ক্রমশ বিকশিত হয়ে উঠেছিল। অভিজাত নাগরিক সাহিত্যের পাশাপাশি লৌকিক জনসভার সাহিত্যও তার মৃত্তিকাগন্ধী সজীবতা নিয়ে নিজ মহিমায় ভাস্বর ছিল। অভিজাত-অনভিজাত, আর্য ঐতিহ্যবাহী বা অনার্যসম্ভূত, রাজসভা এবং জনসভার মত দ্বিধাবিভক্তিকরণ থাকলেও এই শ্রেণিগুলির মধ্যে এমন দূরত্ব কখনোই ছিল না যাতে

পরস্পরের সংশ্রবটুকুও না থাকে। বরং শিষ্ট অভিজাতবর্গ একসময় তাদের প্রয়োজনেই লৌকিক সাহিত্য-সংস্কৃতিকে গ্রহণ করলেও জীবনের দাবিতেই তাদের মিশ্রণ ঘটেছিল। কিন্তু উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে নতুন নগর কলকাতায় অনেক কিছু বদলের পাশাপাশি এই বিষয়েও বদল ঘটেছিল। উনিশ শতকের জীবন-ইতিহাস পর্যালোচনার সূত্র ধরে এগোলে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়। তা হল ঐ সময়পর্বে প্রাচীন দেশজ সাহিত্য-সংস্কৃতির চেহারা বদলে যাচ্ছিল নতুন নাগরিকতার দাবিতে। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন ‘পুরোনো লোকসাহিত্যের ধারা এই নাগরিক পরিবেশে, অতীতের রেশ বজায় রেখেও শহুরে মোড় নিয়েছিল পারিপার্শ্বিক সামাজিক পরিস্থিতি ও ঘটনার চাপে।’[১২] আস্তে আস্তে পরিস্থিতির বদল ঘটছিল। এতকাল উচ্চকোটির কুলীন সাহিত্যের সমান্তরালেই সমানভাবে বয়ে চলেছিল এই ধারা। কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই এই দেশজ সাহিত্য-সংস্কৃতিকে অপর বলে দূরে ঠেলে দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়, জীবনের মূল স্রোত থেকে তাকে কৌশলে সরিয়ে দেওয়ার খেলা চলতে থাকে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে এসব রুচিবর্জিত, অপরিশীলিত। কাজেই এগুলির চর্চা মানব সভ্যতার উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ। অথচ মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রাচীন সামন্ততন্ত্র এবং নব্য বণিকতন্ত্রের মিশেলে জাত হঠাৎ-ধনী, শিক্ষা-সংস্কৃতির বনেদহীন এক প্রভাবশালী উঠতি সম্প্রদায়ের চাহিদাতেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপে দেশজ সাহিত্য-সংস্কৃতি হারিয়েছিল তার গভীর ভূমি। আর পরিণতিতে উনিশের দ্বিতীয়ার্ধে তার কপালে জোটে লাঞ্ছনা এবং ভদ্রসমাজ থেকে বিতাড়ন। বাবুদের চটুল আমোদের প্রমত্ততায় জারিত হয়ে দেশজ সাহিত্য-সংস্কৃতির এই রূপবদল আগামীদিনের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভিন্ন রুচির সংস্কৃতির পোষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারেনি। বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে, তাদের রুচি ও পছন্দের সঙ্গে, তাদের অনুমোদিত সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে শিষ্টবর্গের এই বিভাজনের রাজনীতি প্রকট হয়েছে ঔপনিবেশিক কালপর্বে কলোনির কলের পুতুলদের হাত ধরে। সেখানে তারা পরিণত হয়েছে যুযুধান প্রতিপক্ষে, ঘনিয়ে উঠেছে বিরোধের ঘন মেঘ। একথা ঠিক যে উনিশের বহুকাঙ্ক্ষিত নবজাগরণ বাঙালি জীবনে নিয়ে এসেছিল যুগান্তরের ইশারা। এর ফলে মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিধি বিস্তৃত হয়েছিল, নতুন মেধাজীবী সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটেছিল, রুচি আর চাহিদায় এসেছিল রূপান্তর। এসবই ব্রিটিশ শাসনের দান। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, যতই নতুন আলোর দিশা আনুক না কেন, আসলে তাদের লক্ষ্য ছিল নতুন উপনিবেশ গঠন। ফলে চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতার সঙ্গে যেটা এনেছিল তা হল উপনিবিষ্টকে তার শিকড় ভুলিয়ে দেওয়ার মহামন্ত্র। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হলে তাদের প্রয়োজন হয়েছিল বশংবদ প্রজাকুলের, যারা নির্দ্বিধায় তাদের পক্ষাবলম্বন করবে এবং যাদের দ্বারা আস্তে আস্তে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর

মস্তিষ্কের দখল নেওয়া সম্ভব হবে। কাজেই নবজাগরণের নামে আলোর ফাঁদ পেতে তারা প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছিল বিভাজনের রাজনীতিকে। যার ফলেই সাহিত্যিক মানচিত্রে শিষ্ট বনাম অপর এর ফাটল বেড়ে উঠেছিল। আর এর ফলেই আমদানি করা শিক্ষা সংস্কৃতির অভিমানে বিদগ্ধ সমাজের উপেক্ষায় দেশজ সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারা হারিয়েছিল তার কৌলীন্য। ঔপনিবেশিক মূল্যবোধ নির্ধারিত শিক্ষিতের মননচর্চায় তার আর কোনো স্থান থাকেনি। তাকে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল অপর বলে। যা ছিল এতকাল এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মনের খোরাক, তা-ই ব্রাত্য হয়ে পড়েছিল। সুতরাং এই সাহিত্যধারা বরাবর অপর ছিল না, তাকে অপর এ পরিণত করা হয়েছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

আধিপত্যের উনিশশতকীয় রাজনৈতিক সংঘাত : মান্য বনাম অপর

এই অধ্যায়ে আমি মান্য তথা শিষ্ট নাগরিক সাহিত্যের সঙ্গে অপর তথা অনাগরিক সাহিত্যের এবং সংস্কৃতির সংঘাতটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমি উভয় সাহিত্যে ব্যক্ত ভাষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি, নান্দনিকতা, নাগরিকতা, জীবনদর্শন, ঐতিহাসিক চেতনা, নর-নারী সম্পর্ক, শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রসঙ্গ ইত্যাদি নানা দিক থেকে উভয় সাহিত্যের তুল্যমূল্য বিচার করার চেষ্টা করেছি। ভাষার ক্ষেত্রে যেমন দেখেছি কেমনভাবে ক্ষমতাসীনের হাতে ভাষার চেহারা বদলে যেতে বাধ্য হয়। একথা যথার্থ যে প্রতি সমাজেই তার ক্ষমতাশালী শ্রেণির ব্যবহৃত ভাষাই সেই সমাজের আদর্শ বা standard হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শিষ্ট সাহিত্যে প্রযুক্ত ভাষার ক্ষেত্রে অতীতাশ্রয়ী সংস্কৃত ঘেঁষা 'ইতরজনের দুরধিগম্য' ভাষায় সাহিত্যচর্চার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য মহামহিমদের কবলে পড়ে বাংলা ভাষা হয়ে উঠেছিল রীতিমতো তৎসম অধ্যুষিত। ভাষা ও সংস্কৃতির পবিত্রতা রক্ষার নাম করে বাংলা ভাষাকে তার স্বাভাবিক ভূমি থেকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা এবং প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। ভাষার সংস্কৃতায়নের প্রাণপণ প্রয়াসে বাংলা ভাষাকে ঘিরে ধরছিল এক ভাষাগত কুসংস্কার। সেখানে দাঁড়িয়ে বটতলা ছিল খানিকটা হাঁফ ছাড়ার জায়গা, যেখানে ভাষার সতীত্বরক্ষার দায় বা চোখরাঙানি নেই। সে কারণে অবশ্য তাকে কম নিন্দিত হতে হয়নি। অথচ সহজবোধ্য কথ্য ভাষায় রচিত বইগুলি স্বল্পশিক্ষিত পাঠক ও লেখকের মধ্যে তৈরি করছিল আন্তঃসম্পর্ক। আবার অশ্লীলতা প্রসঙ্গেও দুই সাহিত্যধারা দুই ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাস রেখেছিল। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে বাঙালির সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক রুচি বদলের উদ্দেশ্যে ঊনবিংশ

শতাব্দীর প্রথম থেকেই পাশ্চাত্য প্রভুশক্তির নানাবিধ অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ শুরু হয়। ধর্মপ্রচার ও শিক্ষাবিস্তার উভয় ক্ষেত্রেই তারা শুচিতা, রক্ষণশীলতা, নীতিমূলকতার জয়গান করতে থাকে এবং একই সঙ্গে আমাদের দেশজ সাহিত্য-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। যাবতীয় দেশজ ঐতিহ্যনির্ভর সৃষ্টিকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। আর তাদের অনুগত এদেশের ভদ্রশ্রেণি তাদের নির্ধারিত সংজ্ঞা মেনে নিজেদের সাহিত্যসম্ভারকে শ্লীল করে তোলার কাজে মনোনিবেশ করে। সূক্ষ্ম রাজনীতির খেলায় তাদেরই অবজ্ঞার দৃষ্টিপাতে বিকল্প পরিসরের সাহিত্য হয়ে ওঠে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। ঠিক তেমনই নান্দনিকতার দিক থেকেও দুই ধারার সাহিত্যের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষিত হয়। শিষ্টবর্গের অনুমোদিত শোভন পরিশীলিত সুচারু বিষয়ভাবনা, ভাষাশৈলী, বিন্যাসকৌশল আয়ত্ত করে উনিশের নাগরিক সাহিত্য স্পর্শ করেছিল নান্দনিকতার নন্দনকানন। তারই পাশে সমস্ত আবরণ এবং আভরণহীন ভাষা, বিষয় এবং প্রকাশভঙ্গিকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলা অপর সাহিত্য নান্দনিকতার ধার ধারেনি। মান্য নাগরিক সাহিত্য যেখানে নতুন মূল্যবোধ, নতুন আদর্শ, নতুন নাগরিকতার নতুন নতুন মাত্রা তুলে ধরেছে সেখানে অপর সাহিত্য সাময়িকতার দ্বারাই বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়ে কেবল সেই সাময়িকতার দলিল হওয়ার শর্ত পূরণ করেছে। শুধু তাই নয়, বহু ক্ষেত্রেই প্রগতিশীলতার পরিবর্তে তা রক্ষণশীলতাকেই আঁকড়ে ধরেছে। তবে একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে, সমাজের তথাকথিত দিন-আনা-দিন-খাওয়া মানুষগুলোর চাহিদা, সমস্যা, অসহায়তা, ব্যথা-বেদনার দর্পণও কিন্তু এই কৌলীন্যহীন অপর সাহিত্যই। বটতলার রচনাগুলিতে চোখ বোলালেই তা বোঝা যাবে। শিষ্ট সাহিত্যের জগৎ যেখান থেকে বহু দূরবর্তী। শ্রীপান্থ বলেছেন ‘একদিকে ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বাঙালি, সমাজ সংস্কারক এবং ধর্ম আন্দোলনকারীরা, অন্যদিকে কারিগর, শিল্পী এবং নগরে তখনও উদ্‌বাস্তু প্রায় গ্রামবাংলার ভাগ্যান্বেষী মানুষের দল। শহরের আলো হাতছানি দিয়ে তাদের কাছে টেনে এনেছে, কিন্তু আপন করতে পারেনি। নগরের হালচাল দেখে তারা বিভ্রান্ত, বিচলিত, হতাশ এবং বিমর্ষ। কেননা, পুরনো মূল্যবোধ এখানে বিপর্যস্ত, অথচ যা কিছু নতুন তার মধ্যে বৈপরীত্য, শঠতা এবং কপটতাও তো কম নয়।’[১৩] এই জটিল সামাজিক নকশাতেই বাঙালির সমাজ এবং সংস্কৃতিতে সংঘাতের মেঘ ঘনীভূত হয়েছে। তবে এরা কেউই কাউকে জমি ছেড়ে দেয়নি। মান্য এবং অপর দুই ধারার সাহিত্যেই পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ছায়া মিলেছে। মান্য বা শিষ্ট সাহিত্যে যেমনভাবে অপর সাহিত্যকে অবজ্ঞা, উপেক্ষা করা হয়েছে, তার প্রতি অবহেলা দেখানো হয়েছে, তাকে নির্মমভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, তেমনভাবেই অপর সাহিত্যও হয়ে উঠেছে মূলধারার সাহিত্যের এবং তার ধারক-বাহকদের কঠোর সমালোচক। মূলধারার সাহিত্যরথীরা

অপর সাহিত্যকে তীব্র তিরস্কার করেছেন, আর অপর সাহিত্য সেখানে বেছে নিয়েছে আর একটি পন্থা। নাক-উঁচু উচ্চবর্গকে পরিহাস করেছে। এখানে সেই ঠাট্টা বা পরিহাসটাই হয়ে উঠেছে তার অন্যতম অস্ত্র। বটতলার লেখাগুলির মধ্যে শুধুমাত্র সস্তা লোকপ্রিয়তার উপকরণ ছিল না, তার মধ্যে একটা স্পষ্ট উচ্চবর্গ বা তথাকথিত বাবুবিরোধী কালচারও ছিল। শিষ্টবর্গের নাকউঁচু মানসিকতার জবাব দেওয়ার আর কোনো উপায় তো তাদের ছিল না, কাজেই কলমের মুখেই তাদের কাটাছেঁড়া করে অবরুদ্ধ ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হত। এদিকে প্রভুশক্তির অনুগত শিষ্টবর্গের পোষিত মূলধারার সাহিত্যের সঙ্গে নব্য নাগরিক নির্মাণের বিষয়টিও জড়িত ছিল। শাসকের অভিপ্রায় ছিল তার আকাঙ্ক্ষিত ছাঁচে নব্য নাগরিক গড়ে উঠুক। তার মন-মানসিকতা সব ঢালাই হয়ে যাক নির্বাচিত শর্তে। আর যেখানে সেই শর্ত লঙ্ঘিত হবে বা হবার সুযোগ থাকবে, তাকেই কৌশলে ঠেলে দেওয়া হবে প্রান্তসীমায়। এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে প্রদীপ বসু উল্লেখ করেছেন 'যখন আরেকটা ধারা আরেকটা গোত্রের সাহিত্যকে প্রান্তের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে; তার মানে হচ্ছে, নাগরিক তৈরি করার প্রক্রিয়ার ভেতর সেটাকে আর অন্তর্ভুক্ত করা যাচ্ছে না। আনা যাচ্ছে না এই কারণেই যে যদি সেটা আসে তাহলে মূলধারার প্রক্রিয়াটি বিঘ্নিত হবে। এর মধ্যে রাষ্ট্রেরও একটা ভূমিকা আছে।...এই সাহিত্য কোনোভাবে রাষ্ট্রকে অন্তর্ঘাত করতে পারে। তার ফলে এটা বাতিল হতে থাকে এবং হয়েছে।'[১৪] এটাই আধিপত্যবাদের প্রধানতম শর্ত। তার অঙ্গুলিহেলনেই নির্ধারিত হয়েছে নব্য নাগরিক এবং নব্য সাহিত্য-সংস্কৃতির নতুন সংজ্ঞা।

পঞ্চম অধ্যায়

শিষ্ট সাহিত্য ও অপর সাহিত্য : দ্বান্দ্বিকতার ফলাফল

এই অধ্যায়ে শিষ্ট নাগরিক সাহিত্য বনাম অপর সাহিত্যের দ্বান্দ্বিকতার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করেছি। শিষ্ট সাহিত্য সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষের দ্বারাই সৃষ্ট, প্রচারিত, আস্বাদিত। বিপরীতে অপর সাহিত্য বিপুল সংখ্যক মানুষের মানসিক আমোদের যোগানদার ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে অগণিত মানুষের কাছে পৌঁছে তার রুচিকে তৃপ্ত করলেও পরিণামে তার জিত হয়নি। কারণ সর্বক্ষেত্রে সংখ্যা দিয়ে হার-জিতের বিচার হয় না। হার-জিত নির্ভর করে ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির ওপর, যে ক্ষমতা এক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় শিষ্টবর্গের হাতে আবদ্ধ। চিরকালই উচ্চবর্গ যে কোনো ক্ষেত্রে নিজের মনোনীত বিষয়কে প্রাধান্য দেয় এবং তাকে সমাজমনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বার্থে চেষ্টা চালায়। উনিশ শতকেও নব্য শিক্ষার গর্বে গর্বিত শিষ্ট সমাজের ধারক-বাহকেরা

ঔপনিবেশিক প্রভুশক্তির সাহচর্যে নিজেদের সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক রুচিকে পুনর্নির্মাণ করার কাজে মেতে উঠেছিল। এমনভাবেই তার কাঠামো নির্মিত হয়েছিল যাতে তা প্রভুশক্তির অনুমোদন পায়। আসলে কলোনির নকলনবিশি শিক্ষার নিরর্থকতা তখনো তাদের সামনে প্রকট হয়ে ওঠেনি। খর্বিত কর্মশক্তি ও খর্বিত আত্মমর্যাদা তখনও পীড়ন করতে শুরু করেনি বিবেককে। নব্যশিক্ষা বলে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একটা কুহেলি তখন তাদের চোখে মায়াকাজল পরিয়ে দিয়েছিল। সে সময়ে তাদের বিশ্বাসমুগ্ধতার অন্ত ছিল না, বরং জীবিকা আর জীবনধারণের প্রশ্নে মধ্যবিত্ত মেধাজীবী বাঙালি স্বাভাবিক কারণেই সেদিকে ঝুঁকে পড়েছিল। ব্রিটিশ শাসনকে ভেবেছিল বিধাতার আশীর্বাদ। সমালোচকের কণ্ঠেও ধরা পড়েছিল সেই স্বরের অনুরণন: ‘The British conquest of Bengal was not merely a political revolution, but brought in a greater revolution in thought and ideas, in religion and social progress. The Hindu intellect came in contact with all that is noblest and most healthy in European history and literature, and profited by it.’[১৫] নতুন শিক্ষা এবং রুচির স্পর্শে বাঙালি সমাজের চিরাভ্যস্ত গতানুগতিক আচার, বিচার, সংস্কারগুলি প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়েছিল, তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু নতুনের মোহ বা আকর্ষণ দুর্বার। আর এই মোহে পড়ে পাশ্চাত্যের সবকিছুই শ্রেষ্ঠ আর আমাদের এতকালের সবকিছুই নিকৃষ্ট---এরকম একটা ভ্রান্ত ধারণা তাদের মস্তিষ্ককে অধিকার করে নিয়েছিল। শ্যামলী চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন ‘ইংরেজ শাসনের কারসাজিতে গড়ে ওঠা নতুন রুচি ও চাহিদার মোহে সমগ্র সমাজ সহজ ঐতিহ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিল এবং স্বাভাবিকতা হারিয়ে হয়েছিল উদ্‌ভ্রান্ত।’[১৬] ইন্ধন যুগিয়েছিল প্রভুশক্তি আর অক্ষরে অক্ষরে তাদের নির্দেশ কার্যকরী করতে শুরু করেছিল পাশ্চাত্যপ্রভুর অনুগত এদেশের ভদ্রশ্রেণি। সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের এই খেলায় ‘কলোনীর কলের পুতুল’রা স্বেচ্ছায় স্বীকার করেছিল প্রভু সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বকে। পাশ্চাত্যমনস্ক এই শিষ্টবর্গের দাপটেই ক্রমশ নির্বাসিত আর পরজীবী হওয়ার যন্ত্রণায় দেশজ সাহিত্য-সংস্কৃতির অস্তিত্বের সংকট দেখা দিয়েছিল। তথাকথিত নব্য শিক্ষাগর্বী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে কোনোরকম পরিপোষকতা বা শুশ্রূষা লাভ করার সৌভাগ্য এই ধারার হয়নি। এক অসম যুদ্ধে সে কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল। তার পশ্চাদপসরণ হয়ে উঠছিল অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। অন্তহীন অভিমানে ভদ্রসমাজ থেকে বিতাড়িত হয়ে তার স্থান হয়েছিল তথাকথিত প্রান্তেবাসীর প্রাঙ্গণে। অকরুণ নিঃস্পৃহতায় আচ্ছন্ন মন নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে প্রান্তের মর্মের যোগ ছিন্ন করে দিয়েছিল প্রাণের উৎস শুকিয়ে যাওয়া মানুষগুলো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

উপনিবেশের আলো-আঁধারি প্রহরে বাঙালি ভদ্রলোকের জীবন ও সাহিত্য যাপনে আভাসিত হয়েছিল স্ববিরোধিতায় ভরা আত্মরূপায়নের এক কর্মসূচী। তাই উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য একই সঙ্গে বাঙালি ভদ্রলোকদের স্বপ্নের সৃজন এবং স্বপ্নভঙ্গের ইতিবৃত্ত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো সেই বৃত্তান্তের নানা অভিমুখ ধরা পড়েছে। কিন্তু নতুন আকাঙ্ক্ষা এবং তারই পাশাপাশি তাকে ঘিরে এক অজানা আশঙ্কার যে আবর্ত সেই পর্বকে অস্থির করেছিল, সেই অস্থিরতার ছাপ সেকালের সৃজনকর্মের গভীরে সূক্ষ্মভাবে নিহিত আছে। ঔপনিবেশিক শক্তির হাত ধরে সমাজের তথাকথিত প্রগতিশীল অংশ প্রবেশ করে এক নতুন মায়াবিশ্বে। কিন্তু ক্রমশ সেই মায়ামোহ বিলীন হতে শুরু করলে তারা আবিষ্কার করে সব দিক থেকেই তারা পর-অধিকৃত হয়ে পড়েছে। সেই আত্ম-অবমাননা থেকে সহজে মুক্তি মেলবার নয়। পরঅধিকৃত দেশকে হয়তো বাহুবলে মুক্ত করা সম্ভব, কিন্তু পরকবলিত চৈতন্যের উদ্ধার বড় সহজ কাজ নয়। আর তা যদি না হয়, তাহলে সেই মুক্তিও অসম্পূর্ণ। উনিশ শতকের ভদ্রসমাজ নানা টানাপোড়েনে অস্থির, নানা অসঙ্গতিতে বিভ্রান্ত। ঔপনিবেশিক শক্তির দখলদারি মানসিকতার সূত্রে উপনিবেশের মানুষ অনেককিছু হারিয়েছে। তাদের রীতি-নীতি, আচার-বিচার, ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতি সমস্ত কিছুই প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়েছে। উড়ে-এসে জুড়ে বসে ঔপনিবেশিক প্রভুরা উচ্ছেদ করে দিয়েছে উপনিবিষ্টের এতকালের জীবনযাপনের সমস্ত শর্তগুলিকে। মুখে প্রচার করেছে তাদের সাধু-সংকল্পের কথা। অনুন্নতদের সভ্য এবং উন্নত করে তোলার মহান ব্রতের কথা। এদিকে বিনিময়ে দখল করেছে তথাকথিত অনুন্নতদের সমস্ত সম্পদ। চেয়েছে তাদের প্রশ্নহীন আনুগত্য। আর এসব নানা কৌশলে উপনিবিষ্ট ক্রমশ হয়েছে অনিকেত। আত্মবিস্মৃতি আর আত্মধ্বংসের বিনির্মিত রূপকে মোড়া দেশকালে বিলিতি শিক্ষার মোহে দেশজ ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের বদলে যাওয়া দৃষ্টিকোণ ও জীবনবোধকে অসামান্যভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নিরীক্ষণ করেছিলেন দেশীয় ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন চিন্তাশীল মানুষগুলোকে। দেখেছিলেন এক দুরারোগ্য স্মৃতিভ্রংশ তাদের চেতনাকে খণ্ডিত করে রেখেছে। চেতনার এই মন্বন্তর প্রসঙ্গে তাঁর স্বদেশী সমাজ বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলেন ‘আমাদের হৃদয় যে গোরার কাছে দাসখত লিখিয়া দিয়াছে, আমাদের রুচি যে সাহেবের দোকানে বিকাইয়া গেল!’[১৭] তিনি আরো জানিয়েছিলেন শুধু আর্থিক দুর্দশা ও সম্পদের বহির্গমনই একমাত্র শোচনার কারণ নয়, আত্মিক পতনও সমান গ্লানিকর---‘দেশের টাকা নানা পথ দিয়া নানা আকারে বিদেশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে বলিয়া আমরা

আক্ষেপ করি---কিন্তু দেশের হৃদয় যদি যায় দেশের সহিত যত কিছু কল্যাণসম্বন্ধ একে একে সমস্তই যদি বিদেশী গবর্মেন্টেরই করায়ত্ত হয়, আমাদের আর কিছু অবশিষ্ট না থাকে, তবে সেটা কি বিদেশগামী টাকার স্রোতের চেয়ে অল্প আক্ষেপের বিষয় হইবে?'[১৮] উনিশ শতকের শিষ্ট নাগরিক সাহিত্যের প্রতাপে অপর হয়ে ওঠা দেশজ সাহিত্যের এবং সংস্কৃতির ক্রম-অপসারণ সত্যিই আক্ষেপের বিষয়। কারণ এরই সঙ্গে মুছে দেওয়ার, অস্বীকার করার চেষ্টা হয়েছে একটা বিশেষ সময়পর্বের একটা বিশেষ ইতিহাসকে। তাকে সংরক্ষণের কোনো চেষ্টাই হয়নি। আইন শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রের তর্জনীতে সায় দিয়ে শোষক ও শোষিতের, কলোনিয়াল ও কলোনাইজড্ এর মধ্যে চিরস্থায়ী করেছে আবহমান বিচ্ছিন্নতাকামী ভাবনার মূল। সেই মূলের দীর্ঘায়ত বিস্তারে উনিশ শতকের দেশজ সাহিত্য-সংস্কৃতি হয়েছে আলো-আঁধারের বৈপরীত্যে দিশাহারা, নিজভূমে পরবাসী।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. খাস্তগীর, আশিস, *বটতলার বইয়ের বাজার,* অদ্রীশ বিশ্বাস ও অনিল আচার্য সম্পাদিত *বাঙালির বটতলা প্রথম খণ্ড,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৬৮

২. ঘোষ, অনিন্দিতা, *বটতলার বইবাজার ও তার সামাজিক ইতিহাস,* অদ্রীশ বিশ্বাস ও অনিল আচার্য সম্পাদিত *বাঙালির বটতলা প্রথম খণ্ড,* পৃ. ৪৯

৩. শ্রীপান্থ, *বটতলা,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ২২

৪. বিশ্বাস, অদ্রীশ, *বটতলার বই (১),* অদ্রীশ বিশ্বাস সম্পাদিত, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৩৫

৫. ভট্টাচার্য, তপোধীর, *মিশেল ফুকো, তাঁর তত্ত্ববিশ্ব,* দে' পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ. ৮২

৬. বিশ্বাস, অদ্রীশ, *বটতলার বই (২),* অদ্রীশ বিশ্বাস সম্পাদিত, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১, পৃ ১০

৭. মূল উদ্ধৃতির জন্য দ্রষ্টব্য Long, J. *A Descriptive Catalogue of Bengali Works,* Calcutta 1855

৮. ঘোষ, বিনয়, *নবজাগৃতিকেন্দ্র কলিকাতা,* বাংলার নবজাগৃতি, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, পরিবর্ধিত সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৮৬, কলকাতা, পৃ. ২

৯. Deb, Binaya Krishna, *The Early History and Growth of Calcutta,* The Bengal Printing Company Limited, No. 7, Council House Street, 1905, p.3

১০. পোদ্দার, অরবিন্দ, *শস্যের ভিতরে রৌদ্র : অন্বিষ্টের সন্ধানে সমাজমানস,* স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি,* পুস্তক বিপণি, ২০০৩, কলকাতা, পৃ. ৩২

১১. চৌধুরী, প্রমথ, *বই পড়া,* সুমিতা চক্রবর্তী সম্পাদিত *প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধ সংগ্রহ,* প্রজ্ঞা বিকাশ, প্রথম প্রজ্ঞা বিকাশ সংস্করণ, ৭ আগস্ট ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ১৮১

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, *সোনাগাজি ও বটতলা দুই যমজের কাহিনী, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান,* অনুষ্টুপ, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত অনুষ্টুপ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২২৯

১৩. শ্রীপান্থ, *বটতলা,* পৃ. ১৯

১৪. বসু, প্রদীপ, *বটতলা বিষয়ক সাক্ষাৎকার, বাঙালির বটতলা,* পৃ. ২০-২১

১৫. রায়, অলোক, মুখবন্ধ, *উনিশ শতক,* প্রমা, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২, কলকাতা, পৃ.১১

১৬. চক্রবর্তী, শ্যামলী, *বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প ও সঙ্গীতের জগৎ,* অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, জুলাই ১৯৯০, পৃ. ১৪১-১৪২

১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *স্বদেশী সমাজ, আত্মশক্তি, রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড,* বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৪২২, পৃ. ৬২৮

১৮. ওই, পৃ. ৬৩৩

<u>প্রাথমিক বা আকর গ্রন্থ</u>

১. গুপ্ত, ঈশ্বর, *কবিজীবনী* (ড. ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৮

২. গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র, *ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী* (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে), বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, প্রকাশসাল অনুল্লেখিত

৩. গুপ্ত, বিপিনবিহারী, *পুরাতন প্রসঙ্গ* (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, আগস্ট ১৯৮৯

৪. গোস্বামী কবিরাজ, কৃষ্ণদাস, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত,* (সম্পাদনা শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার), পি, সি, মজুমদার এন্ড ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৪১

৫. চক্রবর্তী, ঘনরাম, *শ্রীধর্মমঙ্গল,* কলিকাতা, বঙ্গবাসী ইলেকট্রো মেশিন প্রেসে শ্রী নটবর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, সন ১৩১৮ সাল

৬. চক্রবর্তী, পঞ্চানন সম্পাদিত, *রামেশ্বর রচনাবলী,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, সন ১৩১৮ সাল

৭. চক্রবর্তী, মুকুন্দ, শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২

৮. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *বঙ্কিম রচনাবলী* (সম্পাদনা যোগেশচন্দ্র বাগল), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৬০

৯. ঠাকুর, টেকচাঁদ, *আলালের ঘরের দুলাল,* (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৪০০

১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *কালান্তর,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, নূতন সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৪১৭

১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ছেলেবেলা,* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ২০১০

১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪১৭

১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড,* ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৪২২

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড,* ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৪২২

১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী,* তৃতীয় খণ্ড, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪২২

১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড,* ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪২১

১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড,* ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, ফাল্গুন ১৪২২

১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড,* ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৪২২

১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড,* ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, চৈত্র ১৪২২

২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড,* ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৪২২

২১. দত্ত, মধুসূদন, *মধুসূদন গ্রন্থাবলী,* (শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা ,ফাল্গুন ১৩৪৭

২২. দাস, বৃন্দাবন, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত,* সাহিত্যসঙ্গী, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২

২৩. দাসী, বিনোদিনী, আমার কথা ও অন্যান্য রচনা, (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত), সুবর্ণরেখা ,কলকাতা ১৩৯৪

২৪. ন্যায়রত্ন, রামগতি, *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব,* সুপ্রীম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, নূতন সংস্করণ ১৯৯১

২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ (সম্পাদিত), *রসরাজের রসকথন,* সংবাদ, কলকাতা, জানুয়ারী ২০১৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেব্‌জিত (সম্পাদিত), *বাই-বারাঙ্গনা গাথা,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৬

২৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত (সংকলিত), *বেশ্যাসংগীত বাইজিসংগীত* ,সুবর্ণরেখা, কলকাতা ২০০১

২৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, *ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সংগ্রহ* (রমেন কুমার সর সম্পাদিত), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা ২০১৩

২৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র, *বৃত্রসংহার,* চতুর্দশ সর্গ, (সম্পাদনা তরুণ মুখোপাধ্যায়), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আষাঢ় ১৪১৭, জুন ২০১০

২৯. বসু, কাঞ্চন (সম্পাদিত), *দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (৩ খণ্ড),* রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯২

৩০. বসু, মনোমোহন, *মনোমোহন বসুর অপ্রকাশিত ডায়েরী,* (সুনীল দাস সম্পাদিত), সাহিত্যলোক, কলকাতা ১৯৮১

৩১. বসু, রাজনারায়ণ, *আত্মচরিত,* ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা ১৯৮৫
৩২. বসু, রাজনারায়ণ, *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা,* গ্রন্থন সংস্করণ জুলাই ১৯৭৩
৩৩. বিশ্বাস, অদ্রীশ (সম্পাদিত), *বটতলা (২ খণ্ড),* গাংচিল, কলকাতা ২০১১
৩৪. বিশ্বাস, হার্দিকব্রত (সংকলন ও সম্পাদনা), *প্রহসনে কলিকালের বঙ্গমহিলা,* চর্যাপদ, কলকাতা ২০১১
৩৫. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন সম্পাদিত *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্দশ সংস্করণ, মে ২০১৩
৩৬. ভট্টাচার্য, মৌ (সম্পাদিত), *বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ সংগ্রহ,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০১১
৩৭. মিত্র, দীনবন্ধু, সধবার একাদশী, মলয় রক্ষিত সম্পাদিত *সধবার একাদশী পুনর্বিচার,* অক্ষর প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০১৫
৩৮. মুখোপাধ্যায়, শ্রী ভুবনচন্দ্র, *হরিদাসের গুপ্তকথা,* বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৯৪
৩৯. মুখোপাধ্যায়, ভূদেব, *পারিবারিক প্রবন্ধ,* প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, ভূদেব রচনা সম্ভার, কলকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ
৪০. মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন (সম্পাদিত), *দাশরথি রায়ের পাঁচালী,* কলিকাতা, ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ষ্টীম মেসিন প্রেস হইতে শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, সন ১৩০৯
৪১. রায়, ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল* (জয়িতা দত্ত সম্পাদিত), রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ আশ্বিন ১৪১৭, সেপ্টেম্বর ২০১০
৪২. শাস্ত্রী, শিবনাথ, *আত্মচরিত,* দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ২০১৩
৪৩. শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* (বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত), নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০০৩
৪৪. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, *বাংলা ভাষা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ২০০০, কলকাতা
৪৫. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, *হুতোম প্যাঁচার নকশা,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৮৪
৪৬. সেন দীনেশচন্দ্র সংকলিত *পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা,* কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮
৪৭. সেন, নবীনচন্দ্র, *আমার জীবন, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড,* দত্তচৌধুরী অ্যান্ড সন্স, কলকাতা ১৩৮২ বঙ্গাব্দ

৪৮. সেন, রামপ্রসাদ, *ভক্তের আকুতি,* শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত *শাক্তপদাবলী (চয়ন),* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, একাদশ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ২০০২

সহায়ক গ্রন্থ

১. গঙ্গোপাধ্যায়, মনোমোহন, *বাংলার নবজাগরণের স্বাক্ষর,* কনটেম্পোরারি পাব, কলকাতা ১৩৭০

২. গুপ্ত, সমুদ্র, *শহর কলকাতার আদিপর্ব,* নতুন সাহিত্য ভবন, ১৯৫৬

৩. গুপ্ত, সুশীলকুমার, *ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ,* এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭

৪. গুপ্ত, সুশীলকুমার, *কলকাতার ইতিকথা,* গ্রাফিক, কলকাতা, ১৯৯৪

৫. গুহ, রণজিৎ, *দয়া : রামমোহন ও আমাদের আধুনিকতা,* তালপাতা, কলকাতা, ২০১১

৬. গুহ, রণজিৎ, *নিম্নবর্গের ইতিহাস,* গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নবম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৮

৭. ঘোষ, বিনয়, *কলকাতা কালচার,* বিহার সাহিত্য ভবন প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম সং, শ্রাবণ ১৩৬০

৮. ঘোষ, বিনয়, *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত,* বাক্ সাহিত্য, জানুয়ারি ২০০৪

৯. ঘোষ, বিনয়, *টাউন কলিকাতার কড়চা,* বিহার সাহিত্য ভবন, কলকাতা, ১৯৬১

১০. ঘোষ, বিনয়, *বাংলার নবজাগৃতি,* ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, পরিবর্ধিত সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৮৬

১১. ঘোষ, বিনয়, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ,* প্রকাশ ভবন, ১৯৮৭

১২. ঘোষ, বিনয়, *মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ,* ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান মুদ্রণ ২০০৯

১৩. ঘোষ, বিনয়, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১-৫ খণ্ড),* পাঠভবন, কলকাতা, ১৯২৩

১৪. চক্রবর্তী, জাহ্নবী কুমার, *শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা,* ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪১৩

১৫. চক্রবর্ত্তী, জীবানন্দ, *বটতলার ভোরবেলা,* পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১

১৬. চক্রবর্ত্তী, শ্যামলী, *বঙ্কিমচন্দ্র এবং ভাটপাড়ার পণ্ডিতসমাজ,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪

১৭. চক্রবর্ত্তী, শ্যামলী, *বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প ও সংগীতের জগৎ,* অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৯০

১৮. চক্রবর্ত্তী, সুধীর, *বাংলার গৌণধর্ম,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, মে ২০০৩

১৯. চৌধুরী, কমল, *কলকাতার তিনশ বছরের ইতিহাস,* সংস্কৃতি কেন্দ্র, প্রতিভাস, কলকাতা, মে ১৯৯০

২০. চৌধুরী, দর্শন, *বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৯

২১. চৌধুরী, প্রমথ, *প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধ সংগ্রহ* (সুমিতা চক্রবর্তী সম্পাদিত), প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৩

২২. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম পর্যায়),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুলাই ২০০৫

২৩. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ২০০৬

২৪. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (চতুর্থ পর্যায়),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ জুন ২০১৪

২৫. দত্ত, জয়িতা, *উত্তর আধুনিক সময়ের অ্যালবাম থেকে,* দে পাবলিকেশনস্, কলকাতা, ২০১০

২৬. দত্ত, মহেন্দ্রনাথ, *কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা,* মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, কলকাতা, ১৯৭৩

২৭. নাগ, অরুণ (সম্পাদিত) *সটীক হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা,* সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৯৮

২৮. পত্রী, পূর্ণেন্দু, *কলকাতা কী করে হল,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ আগস্ট, ১৯৭২

২৯. পত্রী, পূর্ণেন্দু, *বঙ্কিম যুগ, প্রথম খণ্ড (১৮৩৮-১৮৫৮),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৬

৩০. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ খণ্ড),* মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা ১৯৭৩

৩১. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, *রাজসভার কবি ও কাব্য,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০০১

৩২. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, শ্রাবণ ১৪০৫

৩৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২ খণ্ড),* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, যথাক্রমে ১৩৭৭ ও ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ

৩৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, *গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস উপনিবেশবাদ ও শিশুসাহিত্য,* কারিগর, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৩

৩৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, *পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর আধুনিক ভারতের ইতিহাস,* ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, হিমায়ৎনগর, হায়দ্রাবাদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ২০১৮

৩৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ২০১৫-২০১৬

৩৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, অশ্রুত কণ্ঠস্বর, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০২

৩৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩

৩৯. বসু, দেবাশিস (সম্পাদিত), কলকাতার পুরাকথা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৯০

৪০. বসু, যোগীন্দ্রনাথ, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,* অশোক পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৯৭৮

৪১. বসু, স্বপন, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, অগাস্ট ২০১৬

৪২. বসু, স্বপন (সম্পাদিত ও সংকলিত) *সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ (২ খণ্ড),* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০১৩

৪৩. বসু স্বপন ও চৌধুরী ইন্দ্রজিৎ (সম্পাদিত), *উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা ২০০৩

৪৪. বাগল, যোগেশচন্দ্র, *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা,* বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলকাতা, মে ২০১১

৪৫. বাগল, যোগেশচন্দ্র, *কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র,* বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলকাতা, ২০১৩

৪৬. বাগল, যোগেশচন্দ্র, *বাংলার নব্যসংস্কৃতি,* বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, মার্চ ১৯৫৮

৪৭. বিশ্বাস অদ্রীশ ও আচার্য অনিল (সম্পাদিত), *বাঙালির বটতলা,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩

৪৮. ভট্টাচার্য, তপোধীর, *মিশেল ফুকো, তাঁর তত্ত্ববিশ্ব,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৩

৪৯. ভদ্র, গৌতম, *ন্যাড়া বটতলায় যায় কবার,* ছাতিম বুকস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১
৫০. মল্লিক, প্রমথনাথ, *কলিকাতার কথা (আদিকাণ্ড ও মধ্যকাণ্ড),* (সম্পাদনা ড. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১১
৫১. মিত্র, রাধারমণ *কলিকাতা দর্পণ,* সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮০
৫২. মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন, *কলিকাতা সেকালের ও একালের,* পি এম বাগচী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, মে ২০১৩
৫৩. রায়, অলোক, *উনিশ শতক,* প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১২
৫৪. রায়, নিশীথরঞ্জন, *কলকাতা : ইতিহাসের উপাদান,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৮৯
৫৫. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিমার্জিত অষ্টম সংস্করণ আষাঢ় ১৪২২
৫৬. রায়, সুপ্রকাশ, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,* র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, কলকাতা ১৯৭২
৫৭. লাহিড়ী, কার্তিক, *কলকাতার গ্রাম্যতা ও বাঙালি বুদ্ধিজীবী,* প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯
৫৮. শেঠ, হরিহর, *কলিকাতা পরিচয়,* প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন ১৯৩৪ (১৩৪১)
৫৯. শ্রীপান্থ, *কলকাতা,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯
৬০. শ্রীপান্থ, *বটতলা,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৩
৬১. সরদার, মহঃ আবদুর রফিক (সম্পাদিত), *বাংলা দর্পণ নাটক সংগ্রহ,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৪
৬২. সাহা, অর্ণব, ঠিকানা বটতলা, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬
৬৩. সুর, অতুল, *কলকাতা* (চার্নক থেকে সি এম ডি এ পর্যন্ত এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস), জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮১
৬৪. সুর, নিখিল, *কলকাতার নগরায়ন : রূপান্তরের রূপরেখা,* সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫
৬৫. সেন, দীনেশচন্দ্র, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৬
৬৬. সেন, সুকুমার, *বটতলার ছাপা ও ছবি,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

৬৭. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৬
৬৮. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২৩
৬৯. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দশম মুদ্রণ আশ্বিন ১৪২১
৭০. সেন, সুকুমার, *বাংলার সাহিত্য-ইতিহাস,* সাহিত্য অকাদেমি, নবম মুদ্রণ ২০১৫
৭১. Banerjee, Sumanta, *Dangerous Outcast,* Calcutta, Seagull books, 1998
৭২. Banerjee, Sumanta, *The Parlour and the streets,* Seagull books, 1989
৭৩. Chakravorty, Usha, *Condition of Bengali Women around the second half of the Nineteeth Century,* kalikata, 1963
৭৪. Chatterjee, Ratnabali, *The Queens Daughters: Prostitutes as an Outcast Group in Colonial India,* Occassional paper Chr. Michelson Institutes, Bergen, 1992
৭৫. Cotton, H.E.A, *Calcutta Old and New,* Ed. By N.R Roy, W. Newman, 1907
Dasgupta, Harendra Mohan, *Studies In Western Influence On Nineteenth Century Bengali Poetry 1857-1887* ,
৭৬. Dasgupta, Subrata, *Awakening : The Story of the Bengal Renaissance,* Random House India in 2011 Chuckervertty, Chatterjee & Co. Ltd, Kolkata, 1935
৭৭. De, Sushil kumar, *A History of Bengali Literature in the Nineteeth Century,* Calcutta 1919
৭৮. Deb, Binaya Krishna, *The Early History and Growth of Calcutta,* The Bengal Printing Company Limited, No. 7, Council House Street, 1905
৭৯. Dutt, Romesh Chunder, *The Literature of Bengal,* Thacker, Spink & Co., Kolkata, 1895

৮০. Ghosh, Anindita, *Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language and Culture in a Colonial Society 1778-1905,* New Delhi, Permanent Black, 2006
৮১. Kopf. David, *British Orientalism and Bengal Renaissance: the dynamics of Indian Modernization 1773-1835,* Calcutta 1969
৮২. Nair, P. Thankappan (ed.), *Calcutta in the 19th Century*, Firma KLM private limited, Calcutta
৮৩. Nandy, Ashis, *The Intimate Enemy: Loss and Recovery of self under colonialism,* Oxford University Press, 1983
৮৪. Pal, Bipin Chandra, *Memories of My Life and Time,* Calcutta, Bipin Chandra Pal Institute, 1973
৮৫. Ray, Alok (ed.) *Counter Point,* Riddhi India, Calcutta, 1978
৮৬. Sarkar, Susobhan, *On the Bengal Renaissance,* Papyrus, Calcutta 1979
৮৭. Trevelyan, George Otto, *The Life and Letters of Lord Macaulay,* new edition, vol l, London 1895